OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 14
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 124 - 131
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - iv, Published on October issue 2026, Page No. 124 - 131
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘ডাইনী’ গল্পে লোকবিশ্বাস ও গ্রামীণ সংস্কৃতি : কুসংস্কার, সমাজ ও নারীর অবস্থানের পাঠ

প্রিয়াংকা বোস পাল
গবেষক, বাংলা বিভাগ
অ্যাডামাস ইউনিভার্সিটি
Email ID: priyankabose12121991@gmail.com

Received Date *30. 09. 2026*
Selection Date *15. 10. 2026*

Keyword
Folk Culture, Folk Beliefs, Superstition, Rarh Bengal, Marginality, Women, Witch, Social Identity, Social Exclusion, Rural Society.

Abstract

Folk culture in Bengali literature does not merely comprise folk customs, beliefs, legends, religious practices, and rituals, it also includes the ways of life, social relationships, fears, values, perceptions of nature, and psychological tendencies of a particular community to explain the unknown. In the fiction of Tarashankar Bandyopadhyay, the relationship between the rural life of Rarh Bengal, the existence of lower-class people, and folk beliefs is particularly significant. His short story Daini gives this relationship a profound social and psychological dimension through the life experience of a marginalized woman.

The central character of the story, Soradhani, is regarded by society as a ‘witch’. However, an analysis of the narrative reveals that her identity as a ‘witch’ is not established on the basis of any definite supernatural truth. Rather, it is constructed through folk belief, rumour, social suspicion, fear, accusation, and prolonged social rejection. Gradually, Soradhani herself begins to accept the prevailing perception about her as true. Thus, folk belief in the story is not merely superstition, it becomes a cultural force that controls individual identity, social relationships, and human existence.

This paper examines Daini through the interrelationship of folk culture, folk belief, social power, and the marginalization of women. It particularly discusses the construction of Soradhani’s identity as a ‘witch’, the folk belief surrounding the evil eye or nazar, the transformation of social accusation into self-belief, the social insecurity of a lower-class woman, and the influence of caste discrimination on love and marriage. It also examines the social consequences of folk belief in the final outcome of the story.

Tarashankar’s artistic achievement lies in the fact that he does not portray the ‘witch’ merely as a supernatural character. Through folk belief, he constructs the history of a woman’s human desires, inner conflict, humiliation, and social exclusion. In this sense, Daini is not simply a story of superstition, it is a significant exploration of the social and psychological dimensions of folk belief and the marginalized position of women in rural society.

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 14
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 124 - 131
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Discussion

বাংলা কথাসাহিত্যে গ্রামীণ সমাজ ও লোকজীবনের যে বহুমাত্রিক চিত্র পাওয়া যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য তার একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ। তাঁর গল্পে রাঢ় বাংলার প্রকৃতি, নিম্নবর্গীয় মানুষের জীবন, লোকবিশ্বাস, সামাজিক সম্পর্ক এবং মানুষের অন্তর্গত প্রবৃত্তি পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ওঠে। তাঁর গল্পে বেদে, পটুয়া, মালাকার, লাঠিয়াল, বাগদি, বোষ্টম, ডোম প্রভৃতি সাধারণ মানুষের জীবনচিত্রের গুরুত্বের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

'ডাইনী' এই সাহিত্যিক পরিসরের একটি উল্লেখযোগ্য গল্প। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র সোরধনী— একজন দরিদ্র, অনাথ, নিম্নবর্গীয় নারী, যার জীবনকে সমাজ ক্রমশ 'ডাইনী' পরিচয়ের মধ্যে আবদ্ধ করে ফেলে। গল্পটির বিশেষত্ব এখানেই যে, লেখক শুরু থেকেই পাঠককে কোনো সরল অতিপ্রাকৃত সিদ্ধান্তের দিকে নিয়ে যান না। বরং গল্পের ঘটনাবিন্যাসে দেখা যায়, একটি বিশ্বাস কীভাবে মানুষের সামাজিক আচরণকে প্রভাবিত করে এবং শেষ পর্যন্ত সেই বিশ্বাস কীভাবে একজন মানুষের নিজের আত্মবোধকেও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

গবেষক মিল্টন বিশ্বাসের আলোচনায় তারাশঙ্করের 'ডাইনী'-কে রাঢ় অঞ্চলের গ্রামীণ পটভূমিতে নিম্নবর্গীয় নারীর জীবন ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের চিত্র হিসেবে দেখা হয়েছে। তাঁর আলোচনায় আরও উল্লেখ আছে যে 'ডাইনী' গল্পটি তারাশঙ্করের সেইসব রচনার অন্তর্ভুক্ত যেখানে লোকমানসের ভিতর থেকে 'ডাইনি' হয়ে ওঠার ইতিহাসকে শিল্পরূপ দেওয়া হয়েছে। এই প্রবন্ধের মূল প্রশ্ন তাই— সোরধনী কি জন্মগতভাবে 'ডাইনী', নাকি সমাজ তাকে 'ডাইনী' করে তোলে? এই প্রশ্নের অনুসন্ধান করতে গিয়ে লোকবিশ্বাসের সঙ্গে সামাজিক ক্ষমতা, শ্রেণি, জাতি, লিঙ্গ এবং আত্মপরিচয়ের সম্পর্ক সামনে আসে। সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে এই প্রক্রিয়াটি কেবল একটি অন্ধবিশ্বাস নয়, বরং এটি এমন এক সামাজিক বিন্যাস, যার মাধ্যমে প্রান্তিক নারীকে সমাজ নিজের মনগড়া বয়ানে 'অন্য' হিসেবে নির্মাণ করে। পুরুষতান্ত্রিক ও শ্রেণিবিন্যস্ত সমাজ কীভাবে সমষ্টিগত ভীতি ও অজ্ঞতাকে হাতিয়ার করে দুর্বলতম ব্যক্তির ওপর ক্ষমতা প্রয়োগ করে, এই পাঠে তা বিশেষভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

লোকসংস্কৃতি একটি সমাজের দীর্ঘকালীন জীবনচর্চার বহুমাত্রিক প্রকাশ। লোকাচার, লোককথা, লোকগান, প্রবাদ, লোকচিকিৎসা, ধর্মীয় বিশ্বাস, আচার এবং সামাজিক রীতিনীতির পাশাপাশি মানুষের শুভাশুভ ধারণা ও অজানাকে ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টাও এর অন্তর্ভুক্ত। তবে লোকসংস্কৃতি এবং কুসংস্কারকে অভিন্ন বলে দেখা যায় না। লোকসংস্কৃতিবিদ সুধীর চক্রবর্তীর লোকতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, লোকসংস্কৃতি নিছক অতীতচারিতা, অজ্ঞতা বা অনগ্রসর সংস্কারের স্তূপ নয়, বরং তা একটি জনগোষ্ঠীর যৌথ অবচেতন, ঐতিহ্য এবং প্রকৃতি-নির্ভর জীবনসংগ্রামের সামগ্রিক প্রকাশ। ফলে লোকসংস্কৃতি ও কুসংস্কারের মধ্যে একটি স্পষ্ট সীমারেখা টানা প্রয়োজন। লোকসংস্কৃতির সৃজনশীল ধারার বিপরীতে কিছু ক্ষতিকর অন্ধবিশ্বাস যখন সমষ্টির ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়, তখনই তা সামাজিক নিপীড়নের রূপ নেয়। লোকসংস্কৃতি একটি বিস্তৃত সাংস্কৃতিক পরিসর, তার মধ্যে যেমন সৃজনশীল ও সামাজিক ঐতিহ্য রয়েছে, তেমনই কোনো কোনো সমাজে দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত ক্ষতিকর বিশ্বাসও থাকতে পারে। 'ডাইনী' গল্পে এই পার্থক্যটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এখানে 'ডাইনী' ধারণা একটি লোকবিশ্বাসের অংশ। মানুষের কাছে কারও দৃষ্টিতে অমঙ্গল ঘটতে পারে— এই ধারণা প্রথমে ব্যক্তিগত সন্দেহ হিসেবে দেখা দিলেও ধীরে ধীরে তা সমষ্টিগত বিশ্বাসে পরিণত হয়। এরপর সেই বিশ্বাস সোরধনীর সামাজিক পরিচয় নির্ধারণ করে। অতএব, গল্পে লোকবিশ্বাসকে কেবল অশিক্ষা বা অজ্ঞতার ফল হিসেবে দেখলে পাঠটি অসম্পূর্ণ থাকবে। বরং দেখতে হবে— বিশ্বাস কীভাবে সামাজিক আচরণে রূপান্তরিত হয় এবং সেই আচরণ কীভাবে একজন ব্যক্তির জীবনকে বাস্তবভাবে পরিবর্তন করে।

'ডাইনী' গল্পের সূচনাতেই প্রকৃতি ও লোকবিশ্বাসের মধ্যে একটি গভীর সম্পর্ক নির্মিত হয়েছে। ছাতি-ফাটার মাঠের রুক্ষতা, জলহীনতা, ধূলি, তীব্র উত্তাপ এবং নির্জনতা শুধু গল্পের পরিবেশ নয়, তা সোরধনীর জীবন ও মানসিক অবস্থারও প্রতীকী পরিসর নির্মাণ করে। গল্পের প্রথমদিকে গ্রামবাসীর বিশ্বাস অনুযায়ী, ছাতি-ফাটার মাঠের ওপর বহুদিন ধরে এক ডাইনীর বিষদৃষ্টি পড়ে আছে। অর্থাৎ প্রকৃতির অস্বাভাবিকতারও একটি অতিপ্রাকৃত ব্যাখ্যা তৈরি হয়েছে। এখানে প্রকৃতির বাস্তবতা এবং মানুষের কল্পিত ব্যাখ্যা পাশাপাশি অবস্থান করছে। এই পদ্ধতির ফলে লেখক লোকবিশ্বাসকে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 14
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 124 - 131
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

সরাসরি সত্য বা মিথ্যা হিসেবে ঘোষণা করেন না, তিনি দেখান, একটি সমাজ কীভাবে তার চারপাশের বাস্তবতাকে নিজের বিশ্বাসের কাঠামোর মধ্যে অর্থপূর্ণ করে তোলে। এই দিকটি তারাশঙ্করের সামগ্রিক সাহিত্যিক পরিসরের সঙ্গেও সম্পর্কিত। তাঁর রচনায় রাঢ় বাংলার মানুষ, প্রকৃতি এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবন ঘনিষ্ঠভাবে উপস্থিত হয়েছে। তারাশঙ্করের কথাসাহিত্যে স্থান বা ভৌগোলিক পরিবেশ কেবল কোনো বর্ণনামূলক পটভূমি নয়, তা মানবচরিত্রের জৈবিক ও মনস্তাত্ত্বিক নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। রাঢ়বঙ্গের রুক্ষতা, অনাবৃষ্টি, তীব্র খরা এবং অনুৎপাদনশীল লাল মাটি সেখানকার মানুষের অস্তিত্বের লড়াইকে আদিম ও নির্মম করে তোলে। এই ভৌগোলিক প্রতিকূলতা গ্রামীণ লোকমানসে জন্ম দেয় এক গভীর নিরাপত্তাহীনতা ও ভীতি। মনোবিজ্ঞানী কার্ল গুস্তাভ য়ুংয়ের 'যৌথ অবচেতন' সংক্রান্ত তত্ত্বের নিরিখে পর্যালোচনা করলে স্পষ্ট হয় যে, প্রতিকূল প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে পরাস্ত সমাজ নিজেদের পুঞ্জীভূত ভীতি ও আতঙ্ক দূর করতে কোনো দৃশ্যমান প্রতীক খুঁজে নেয়। ছাতি-ফাটার মাঠের জলহীন শুষ্কতা এবং সোরধনীর একাকী বন্ধ্যা জীবন এখানে পরস্পরের পরিপূরক রূপ ধারণ করে। প্রকৃতি যখন রিক্ত ও অনুৎপাদনশীল, গ্রামীণ সমাজ তখন সেই প্রাকৃতিক সংকটের পেছনে কোনো বাস্তব কার্যকারণ না খুঁজে লোকবিশ্বাসের কল্পিত আধারে অমঙ্গল অনুসন্ধান করে। ফলে প্রকৃতির রূঢ়তা এবং সোরধনীর শরীরের বার্ধক্য ও একাকিত্ব এক বিন্দুতে মিলে যায়। তারাশঙ্কর দেখিয়েছেন, কীভাবে পরিবেশগত ভয় ও সমষ্টিগত অবদমন একত্রিত হয়ে সোরধনীর মতো প্রান্তিক নারীকে সমাজের নিজস্ব পাপমোচনের 'বলির পাঁঠা'তে পরিণত করে। এই গল্পে ও তার অন্যথা হয় না। সোরধনীর 'ডাইনী' হয়ে ওঠার প্রক্রিয়াটি গল্পের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক। এখানে 'ডাইনী' পরিচয় কোনো একদিনে তৈরি হয় না। সন্দেহ, গুজব, সামাজিক প্রতিক্রিয়া এবং পুনরাবৃত্ত অপমানের মধ্য দিয়ে এটি ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হারু সরকারের বাড়ির ঘটনা। সোরধনীকে উদ্দেশ করে বলা হয়—

"হারামজাদী ডাইনী, তুমি আমার ছেলেকে নজর দিয়েছ?"[১]

এখানে 'নজর' একটি গুরুত্বপূর্ণ লোকবিশ্বাস। শিশুর অসুস্থতার একটি স্বাভাবিক কারণ খোঁজার পরিবর্তে তার দায় সোরধনীর দৃষ্টির ওপর আরোপ করা হয়। ফলে একটি অসুস্থতা, সন্দেহ, 'নজর', 'ডাইনী' এই ব্যাখ্যার শৃঙ্খল তৈরি হয়। আরও তাৎপর্যপূর্ণ হল, সোরধনী নিজেই এই অভিযোগের বিরুদ্ধে যুক্তি দিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না। বরং অপমানের পরে সে প্রার্থনা করে—

"হে ঠাকুর, আমার দৃষ্টিকে ভালো করে দাও, নাহয় আমাকে কানা করে দাও।"[২]

এই বাক্যটি গল্পের মনস্তাত্ত্বিক কাঠামো বোঝার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সমাজ যে অভিযোগ করেছে, সোরধনী তার সত্যতা যাচাই করার ক্ষমতা হারিয়ে সেই অভিযোগের সম্ভাব্য সত্যতাকেই নিজের মধ্যে ধারণ করতে শুরু করেছে। সমাজতাত্ত্বিক ভাষায় একে বলা যায় কলঙ্কের আত্মীকরণ। সামাজিক অপবাদ যখন দীর্ঘকাল ধরে একজন মানুষের ওপর ক্রমাগত চাপিয়ে দেওয়া হয়, তখন ব্যক্তি একসময় সেই আরোপিত কৃত্রিম পরিচয়কেই নিজের অবচেতনে সত্য বলে মেনে নিতে বাধ্য হয়। ফলে সোরধনীর ট্র্যাজেডি কেবল বাহ্যিক সামাজিক বর্জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, তা তার অন্তর্জগতে এক গভীর আত্মদ্বন্দ্বে রূপ নেয়। 'ডাইনী' এখানে কেবল একটি গালি নয়, এটি সামাজিকভাবে নির্মিত পরিচয়। তাই 'ডাইনী' গল্পে লোকবিশ্বাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ রূপ হল 'নজর' বা দৃষ্টির মাধ্যমে অমঙ্গল ঘটানোর ধারণা। হারু সরকারের ছেলের অসুস্থতার সঙ্গে সোরধনীর উপস্থিতিকে যুক্ত করা হয়। কিন্তু গল্পের পাঠে দেখা যায়, সোরধনী নিজে সেই ঘটনায় আনন্দিত নয়, বরং ছেলেটির সুস্থতার জন্য সে প্রার্থনা করে। গল্পে তাই মনে মনে বলতে শোনা যায়—

"হে ঠাকুর, ভালো করে দাও, ওকে ভালো করে দাও।"[৩]

এরপর ছেলেটি সুস্থ হয়ে গেলে ঘটনাটিকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করার পরিবর্তে সমাজ সোরধনীর ওপর সন্দেহ আরও দৃঢ় করে। অর্থাৎ কোনো ঘটনার কারণ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে পূর্বনির্ধারিত বিশ্বাসই প্রাধান্য পায়। এখানে কুসংস্কারের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে— ঘটনা বিশ্বাসকে তৈরি করে না, বরং পূর্বস্থিত বিশ্বাস ঘটনার অর্থ নির্ধারণ করে। সোরধনীর দৃষ্টিকে 'অশুভ' বলে ধরে নেওয়ার পরে তার প্রতিটি আচরণ সেই ধারণার মধ্য দিয়েই ব্যাখ্যা করা হয়। ফলে তার ব্যক্তিসত্তা আর তার আচরণের বাস্তবতার মধ্যে একটি বিচ্ছেদ তৈরি হয়।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 14
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 124 - 131
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

সোরধনীর চরিত্রকে শুধু কুসংস্কারের শিকার হিসেবে দেখলে গল্পের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা ধরা পড়বে না। তার মধ্যে ক্ষুধা, স্নেহ, আকাঙ্ক্ষা, লজ্জা, অপরাধবোধ এবং সামাজিক ভয়ের সংঘাত রয়েছে। সে কোনো গৃহস্থের বাড়িতে প্রবেশ করতে পারে না, বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে। খাবারের গন্ধে তার স্বাভাবিক ক্ষুধা জেগে ওঠে। কিন্তু সেই ক্ষুধাকেও সমাজের দৃষ্টিতে 'লোভ' ও 'ডাইনীর স্বভাব' হিসেবে দেখা হয়। গল্পে তার মানসিক অবস্থার বর্ণনায় দেখা যায়—

> "কি সুন্দর মাছভাজার গন্ধ, আহা-হা! বেশ খুব বড় পাকা-মাছের খান! বোধ হয়।"[৪]

এরপর তার স্বাভাবিক ক্ষুধা যেন তার নিজের কাছেই অপরাধ হয়ে ওঠে। তারাশঙ্করের শিল্পকৌশল এখানে গুরুত্বপূর্ণ— তিনি 'ডাইনী'র অশুভ ক্ষুধা দেখানোর আগে পাঠককে একটি ক্ষুধার্ত, বঞ্চিত মানুষের অবস্থান দেখতে দেন অর্থাৎ যে ক্ষুধা অন্য মানুষের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক, সোরধনীর ক্ষেত্রে সেটিই সামাজিকভাবে সন্দেহজনক হয়ে ওঠে। 'ডাইনী' গল্প লক্ষ্য করলে দেখা যায় গল্পটির একটি গুরুত্বপূর্ণ পাঠ নারীর সামাজিক অবস্থানের সঙ্গে যুক্ত। সোরধনী শুধু দরিদ্র নয়, সে অনাথ, একাকী এবং নিম্নবর্গীয়। তার সামাজিক সুরক্ষা দুর্বল। ফলে তার বিরুদ্ধে তৈরি হওয়া অপবাদ প্রতিরোধ করার মতো সামাজিক শক্তিও তার নেই। এই প্রান্তিকতার সঙ্গে নারীত্ব যুক্ত হয়ে তার পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তোলে।তাই সোরধনী যখন সাবিত্রীর শিশুকে দেখতে যায়, তার মনে শিশুটিকে কোলে নেওয়ার আকাঙ্ক্ষা জাগে। কিন্তু সাবিত্রীর শাশুড়ির প্রতিক্রিয়া হয়—

> "আকেলখাগী হারামজাদী, খুব যে তাবীসাবীর সঙ্গে মঞ্চর জুড়েছিস! আমার বাছার যদি কিছু হয়, তবে তোকে বুঝব আমি।"[৫]

এখানে সোরধনীর শিশুর প্রতি আকর্ষণকে মাতৃসুলভ স্নেহ হিসেবে গ্রহণ করা হয় না, বরং তা অশুভ উদ্দেশ্যের লক্ষণ হিসেবে ধরা হয়। লিঙ্গতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করলে দেখা যায়, সোরধনীর ট্র্যাজেডি পিতৃতান্ত্রিক সমাজের এক নির্মম দ্বিচারিতাকে স্পষ্ট করে তোলে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারীর মানবিক বৈধতা ও গ্রহণযোগ্যতা মূলত নির্ভরশীল থাকে তার পরিবার, গৃহস্থালি ভূমিকা এবং সন্তান উৎপাদনক্ষমতার ওপর। সোরধনী এই প্রথাগত সামাজিক সুরক্ষাবলয়ের বাইরে অবস্থান করে— সে স্বামীহীন, সন্তানহীনা এবং একাকী। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ যে নারীকে কোনো নির্ধারিত পারিবারিক অনুশাসনে বাঁধতে পারে না, তাকেই সমাজ বিশৃঙ্খলা ও আশঙ্কার উৎস হিসেবে চিহ্নিত করে। সোরধনীর স্বাভাবিক স্নেহ ও মাতৃত্বের আকুলতা যখন সাবিত্রীর শিশুর দিকে প্রসারিত হয়, সমাজ তাকে মাতৃত্বের স্বীকৃতি দেয় না, বরং তাকে চিহ্নিত করে 'বিষদৃষ্টি' হিসেবে। অর্থাৎ, যে নারী সন্তান ধারণ ও লালন-পালনের সামাজিক অধিকার থেকে বঞ্চিত, তার স্বাভাবিক মানবিক অনুভূতির অধিকারটুকুও সমাজ হরণ করে নেয়। পিতৃতান্ত্রিক অনুশাসন এভাবেই একজন সহায়হীন নারীকে তার শরীর ও মনস্তত্ত্বের স্বাভাবিক সংবেদনশীলতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে কেবল একটি অশুভ লোকবিশ্বাসের প্রতীকে পরিণত করে। এই ঘটনাই গল্পের একটি কেন্দ্রীয় বৈপরীত্য নির্মাণ করে— যে নারী স্নেহ করতে চায়, সমাজ তাকে স্নেহের যোগ্য নয়, বরং স্নেহের জন্য বিপজ্জনক বলে ঘোষণা করে। 'ডাইনী' গল্পের সবচেয়ে গভীর মনস্তাত্ত্বিক স্তর তৈরি হয় যখন সামাজিক অপবাদ সোরধনীর নিজের চেতনার অংশ হয়ে ওঠে। তাই সাবিত্রীর শিশুর অসুস্থতার খবর ছড়িয়ে পড়ার পরে সোরধনী নিজের মধ্যেই সন্দেহ করতে শুরু করে। সে এমনকি নিজের মুখের থুতু ও রক্তের মধ্যে সেই 'বিষাক্ত শক্তি'র প্রমাণ খুঁজতে থাকে। গল্পে বলা হয়েছে—

> "সেই দিন সে নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারিয়াছে আপনার অপার নিষ্ঠুর শক্তির কথা।"[৬]

এই উক্তিটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ এখানে 'ডাইনী' পরিচয় বাইরের মানুষের অভিযোগ হিসেবে আর সীমাবদ্ধ নেই, তা সোরধনীর নিজের আত্মবোধে প্রবেশ করেছে। তারপর দেখা যায় তার প্রার্থনা—

> "মা, আমাকে ডাইনী হইতে মানুষ করিয়া দাও, আমি তোমাকে বুক চিরিয়া রক্ত দেব।"[৭]

এই উদ্ধৃতিটি গল্পের অন্যতম কেন্দ্রীয় পাঠ্যপ্রমাণ। সোরধনী 'ডাইনী' হতে চায় না, সে 'মানুষ' হতে চায়। অর্থাৎ তার গভীরতম আকাঙ্ক্ষা অতিপ্রাকৃত শক্তির অধিকারী হওয়া নয়, বরং সামাজিকভাবে স্বীকৃত মানবিক পরিচয়ে ফিরে পাওয়া। এখানে 'ডাইনী' শব্দটির সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক ক্ষমতা স্পষ্ট হয়। সোরধনীর মানবিক সত্তা এবং সামাজিকভাবে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 14
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 124 - 131
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

নির্মিত 'ডাইনী' পরিচয়ের সংঘাত গল্পের কেন্দ্রস্থলে রয়েছে। তাই সোরধনী সাবিত্রীর শিশুর প্রসঙ্গে তার নিজের উপলব্ধি থেকে বলতে থাকে -

> "হইলই বা সে ডাইনী, কিন্তু তাই বলিয়া কি সে সাবিত্রীর ছেলের অনিষ্ট করিতে পারে?"[৮]

এই প্রশ্নটি মূলত তার নিজের মানবিকতার প্রশ্ন। সে নিজেকে 'ডাইনী' বলে ভাবতে শুরু করলেও তার ভেতরের মানবিক সত্তা তখনও প্রতিবাদ করছে। এর পর তার প্রার্থনা আরও মানবিক সত্তাকে আরো বেশি প্রতিষ্ঠিত করে। সে বলে-

> "একশ বৎসর পরমায়ু দিও তুমি সাবিত্রীর খোকাকে, দয়া করিয়া প্রমাণ করিয়া দিও, সাবিত্রীর খোকাকে আমি কত ভালোবাসি!"[৯]

এখানে 'প্রমাণ' শব্দটির তাৎপর্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সোরধনীর নিজের মানবিকতা সম্পর্কে সমাজকে বোঝানোর কোনো সামাজিক ক্ষমতা নেই। তাই সে ঈশ্বরের কাছে নিজের ভালোবাসার প্রমাণ চায়। এই মুহূর্তে গল্পটি কুসংস্কারের সাধারণ সমালোচনা অতিক্রম করে মানবিক স্বীকৃতির আকাঙ্ক্ষার গল্পে পরিণত হয়। সোরধনীর জীবনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল তার প্রেম ও বিবাহের অভিজ্ঞতা। বোলপুরে এক ডোম যুবকের সঙ্গে তার সম্পর্ক তৈরি হয়। যুবকটি তাকে বিবাহ করতে চায়, জাতিগত সামাজিক বাধার কারনে যুবকের বিয়ে হয়নি শুনে সোরধনীর যুবকের প্রতি আরও বেশি প্রভাবিত হয়। যুবকটি বলে—

> "তা জাতে পতিত বলে আমাকে বিয়ে দেয় না কেউ। তু আমাকে বিয়ে করবি?"[১০]

এই সংলাপ গল্পটিকে কেবল কুসংস্কারের আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে না, জাতিগত সামাজিক কাঠামোর প্রশ্নও সামনে নিয়ে আসে। সোরধনী এবং তার প্রেমিক দুজনেই নিম্নবর্গীয় সমাজের মানুষ। তারা সামাজিক স্বীকৃতির বাইরে দাঁড়িয়ে নিজেদের সংসার নির্মাণ করে। কিন্তু সেই সম্পর্কও শেষ পর্যন্ত সোরধনীর জীবনে নিরাপত্তা আনতে পারে না। এখানে নারীর অবস্থান দ্বিগুণভাবে অনিরাপদ— একদিকে সে দরিদ্র ও নিম্নবর্গীয়, অন্যদিকে নারী হওয়ার কারণে সামাজিক ক্ষমতার কাঠামোতে তার অবস্থান আরও দুর্বল। এই দ্বৈত প্রান্তিকতার সঙ্গে যখন কোনো সামাজিক সুরক্ষাহীনতা যুক্ত হয়, তখন যেকোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা রোগের দায় অতি সহজেই তার ওপর চাপিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়। বাউরি যুবকের অসুস্থতাকে কেন্দ্র করে যে 'বাণ মারা'র অপবাদ তৈরি হয়, তার পেছনে কোনো বাস্তব সাক্ষ্যের প্রয়োজন পড়ে না, বরং কুসংস্কার এখানে একটি অলিখিত বিচারহীন সামাজিক শাস্তির হাতিয়ার হয়ে দাঁড়ায়, যার সহজ শিকার হয় এই স্বজনহীন নারী।

গল্পের অন্যতম সূক্ষ্ম দিক হল— সোরধনী ভালোবাসা এবং সংসারকে বুঝতে পারে। ঝরনার ধারে তরুণ প্রেমিক-প্রেমিকার কথোপকথন শুনে তার মনে নিজের অতীতের স্মৃতি জেগে ওঠে। সে স্মরণ করে তার নিজের প্রেমের কথা। সেই স্মৃতির সঙ্গে বর্তমানের তরুণ-তরুণীর সম্পর্ককে মিলিয়ে দেখে। এই অংশে সোরধনীকে কেবল 'ডাইনী' হিসেবে দেখা যায় না, বরং একজন প্রেমে পড়া নারী, যে একসময় সংসারের স্বপ্ন দেখেছিল। তাই যখন সে সেই প্রেমিক তরুনকে সাহায্য করতে চেয়েছিল তাদের বিয়ের জন্য কিন্তু সেই তরুণ বাউরি ছেলেটি তাকে দেখে ভয়ে পালিয়ে যায়, তখন তার মধ্যে ক্ষোভ জেগে ওঠে। গল্পে এই পরিবর্তনটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ভালোবাসা ও স্নেহের আকাঙ্ক্ষা বারবার প্রত্যাখ্যাত হওয়ার ফলে তার মধ্যে ক্রোধ জমে ওঠে। ফলে সোরধনীর চরিত্রকে একমাত্রিক 'অশুভ নারী' হিসেবে পড়া সম্ভব নয়। বরং তার চরিত্রের মধ্যে ক্ষুধা, স্নেহ, ভালোবাসা, প্রত্যাখ্যান, অপমান, আত্মঘৃণা, ক্রোধ— এইসব ধরনের মানসিক পরিবর্তনের ধারাটি লক্ষ করা যায়। গল্পের পরবর্তী পর্যায়ে দেখা যায় সোরধনীর বিরুদ্ধে লোকবিশ্বাস আরও শক্তিশালী সামাজিক রূপ গ্রহণ করে। বাউরি যুবকের অসুস্থতাকে কেন্দ্র করে গ্রামে প্রচারিত হয়—

> "সর্বনাশী ডাইনী বাউরীদের একটা ছেলেকে বাণ মারিয়াছে।"[১১]

এখানে 'বাণ মারা' আর ব্যক্তিগত সন্দেহ নয়, এটি সমষ্টিগত বিশ্বাসের ভাষা। একটি যুবকের অসুস্থতা একটি অতিপ্রাকৃত আক্রমণের ফল বলে ধরে নেওয়া হয় এবং সেই আক্রমণের জন্য সোরধনীকে দায়ী করা হয়। পরবর্তীতে এই বিশ্বাস আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। লোকেরা বিশ্বাস করে, সোরধনী কোনো মন্ত্রপূত অস্ত্রের সাহায্যে যুবকটিকে আক্রান্ত করেছে। অর্থাৎ লোকবিশ্বাস এখানে একটি সামাজিক বিচার ব্যবস্থার কাজ করছে। কোনো ঘটনার বাস্তব কারণ অনুসন্ধানের

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 14
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 124 - 131
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

বদলে সমাজ একটি পরিচিত সাংস্কৃতিক ব্যাখ্যা গ্রহণ করছে এবং সেই ব্যাখ্যার ভিত্তিতে একজন নারীকে অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করছে। সমাজবিজ্ঞানের ভাষায় এটি হল প্রাতিষ্ঠানিক বিচারহীন সামাজিক ক্ষমতার এক নির্মম প্রদর্শন। কোনো প্রমাণ বা যুক্তি ছাড়াই যখন কুসংস্কারকে কেন্দ্র করে সমষ্টি এককাট্টা হয়, তখন লোকবিশ্বাস আইনের সমান্তরালে এক হিংস্র শাস্তিবিধানের চেহারা নেয়। প্রান্তিক, অনাথ ও সহায়হীন নারীকে লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে সমাজ মূলত নিজের সামগ্রিক অনিশ্চয়তা ও অবদমিত ভীতি থেকে মুক্তির রাস্তা খোঁজে। 'ডাইনী' গল্পে কুসংস্কারের সবচেয়ে বিপজ্জনক দিকটি তার সামাজিক কার্যকারিতায়। বিশ্বাস নিজে যতটা শক্তিশালী নয়, তার চেয়েও শক্তিশালী হয়ে ওঠে যখন একটি সমষ্টি সেই বিশ্বাসকে সামাজিক সত্য হিসেবে গ্রহণ করে। সোরধনীর বিরুদ্ধে কোনো প্রাতিষ্ঠানিক বিচার হয় না, কিন্তু তাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য সামাজিক প্রত্যাখ্যানই যথেষ্ট। মানুষ তার কাছ থেকে দূরে থাকে, শিশুরা তাকে দেখে ভয় পায়, যুবকেরা তাকে সন্দেহ করে এবং শেষ পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে সহিংসতার সম্ভাবনাও তৈরি হয়। গল্পে বলা হয়েছে—

> "লোক শিহরিয়া উঠিল, তাহার মৃত্যু-কামনা করিল।"[১২]

এই একটি বাক্যেই সামাজিক অপবাদের চরম পরিণতি ধরা পড়ে। একটি গুজব যখন সমষ্টিগত বিশ্বাসে পরিণত হয়, তখন সেই বিশ্বাস একজন মানুষের বিরুদ্ধে মৃত্যুকামনাতেও রূপ নিতে পারে। এখানেই 'ডাইনী' গল্পের সামাজিক তাৎপর্য। এটি কেবল কুসংস্কারের গল্প নয়, কুসংস্কার কীভাবে সামাজিক শাস্তির কাঠামো তৈরি করে, তারও গল্প। সোরধনীর ক্ষেত্রে 'ডাইনী' অপবাদকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখা যায় না। তার অনাথত্ব, দারিদ্র্য, জাতিগত অবস্থান, একাকিত্ব এবং নারী-পরিচয়— সবমিলিয়ে তাকে সমাজের দুর্বলতম অবস্থানে স্থাপন করেছে। তার জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্মৃতি হল— সে জানে, তাকে সহজে কেউ বিবাহ করতে চাইবে না। এই উপলব্ধি তার নিজের সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে গভীর সচেতনতার প্রকাশ। সে একসময় নিজের জীবন থেকে পালিয়ে যায়। কিন্তু স্থান পরিবর্তন করলেও 'ডাইনী' পরিচয় থেকে মুক্তি পায় না। কারণ সেই পরিচয় কেবল একটি নির্দিষ্ট গ্রামের নয়, লোকবিশ্বাসের বিস্তৃত সামাজিক কাঠামোর অংশ। এখানে একটি কথা বলা জরুরি। 'ডাইনী' গল্পের ভিত্তিতে সমগ্র গ্রামীণ লোকসংস্কৃতিকে কুসংস্কার হিসেবে চিহ্নিত করা ঠিক হবে না। কারন লোকসংস্কৃতির মধ্যে জীবনযাপনের ঐতিহ্য, উৎসব, ভাষা, লোকগান, লোককথা, ধর্মীয় আচরণ এবং সামাজিক স্মৃতি যেমন থাকে, তেমনই নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে কিছু অযৌক্তিক বিশ্বাসও সামাজিকভাবে প্রচলিত হতে পারে।

'ডাইনী' গল্পে তারাশঙ্কর মূলত এই দ্বিতীয় ক্ষেত্রটির সামাজিক পরিণতি দেখিয়েছেন। তিনি গ্রামীণ মানুষকে কেবল 'অশিক্ষিত' বলে প্রত্যাখ্যান করেননি, বরং দেখিয়েছেন, ভয়, অনিশ্চয়তা, সামাজিক দূরত্ব এবং অজানাকে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন কীভাবে একটি বিশ্বাসকে শক্তিশালী করে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে গল্পটি লোকসংস্কৃতির সরল নিন্দা নয়, বরং লোকবিশ্বাসের সামাজিক মনস্তত্ত্বের একটি সাহিত্যিক অনুসন্ধান। তবে এই 'ডাইনী' গল্পে ভাষাও লোকসংস্কৃতি নির্মাণের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। চরিত্রগুলির কথ্যভাষা, সম্বোধন, গালি, জাতিসূচক পরিচয় এবং গ্রামীণ বাক্যভঙ্গি তাদের সামাজিক অবস্থান প্রকাশ করে। বিশেষভাবে 'ডাইনী', 'হারামজাদী', 'নজর', 'বাণ মারা' প্রভৃতি শব্দ কেবল ভাষাগত অভিব্যক্তি নয়, এগুলির মধ্যে সামাজিক বিশ্বাস এবং ক্ষমতার কাঠামো কাজ করে। তাই 'ডাইনী' শব্দটির পুনরাবৃত্তি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমে এটি একটি অভিযোগ, পরে একটি সামাজিক পরিচয় এবং শেষ পর্যন্ত সোরধনীর নিজের আত্মবোধের অংশ হয়ে ওঠে। এই অর্থে নামকরণই এখানে ক্ষমতার একটি রূপ। সোরধনীর নিজের নাম 'সোরধনী' ধীরে ধীরে সামাজিক স্মৃতি থেকে মুছে যায়, তার বদলে 'ডাইনী' নামে সে পরিচিত হতে থাকে। তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই নামকরণ প্রক্রিয়াটি সমাজ কর্তৃক ব্যক্তিকে 'অন্য' হিসেবে প্রতিপন্ন করার প্রত্যক্ষ প্রয়াস। পুরুষতান্ত্রিক ও ক্ষমতাকেন্দ্রিক সমাজ সোরধনীকে তার মানবিক নাম ও সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন করে এমন এক অপার্থিব পরিচয়ে পর্যবসিত করে, যাতে তাকে প্রান্তিকীকরণ ও বর্জন করা সহজ হয়। নাম হারানোর এই প্রক্রিয়াটি কেবল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অবলুপ্তি নয়, বরং সামাজিক নিগ্রহকে বৈধতা দেওয়ার এক সূক্ষ্ম সাংস্কৃতিক কূটকৌশল। ফরাসি দার্শনিক মিশেল ফুকোর ক্ষমতার ডিসকোর্স সংক্রান্ত ধারণাকে সামনে রাখলে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, ভাষা কেবল ভাব বিনিময়ের মাধ্যম নয়, তা ক্ষমতা প্রয়োগ ও সামাজিক আধিপত্যের প্রত্যক্ষ হাতিয়ার। 'ডাইনী' গল্পে ভাষা কীভাবে একজন প্রান্তিক মানুষকে সম্পূর্ণ ক্ষমতাহীন ও বাক্‌রুদ্ধ করে তোলে, তারাশঙ্কর তা অত্যন্ত নিখুঁতভাবে দেখিয়েছেন। সমাজ যখন ধারাবাহিকভাবে সোরধনীকে বিভিন্ন

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 14
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 124 - 131
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

অশুভ অভিধায় চিহ্নিত করতে থাকে, তখন তার নিজের কোনো আত্মপক্ষ সমর্থনের ভাষা অবশিষ্ট থাকে না। তার প্রতিটি দীর্ঘশ্বাস বা স্বাভাবিক আচরণও সমাজের চোখে অপরাধের প্রমাণে পর্যবসিত হয়। উত্তর-ঔপনিবেশিক তাত্ত্বিক গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাকের সাবঅল্টার্ন বা প্রান্তিক কণ্ঠস্বরের তত্ত্বের সূত্রে বলা যায়, সোরধনী এখানে এমন এক ভাষাহীন নিম্নবর্গীয় নারী, যার কথা শোনার মতো সামাজিক ক্ষমতা ও পরিসর কোনোটিই নেই। ভাষার এই আধিপত্যশীল কাঠামো সোরধনীকে এতটাই কোণঠাসা করে যে, সে ধীরে ধীরে সমাজের চাপিয়ে দেওয়া ঘৃণাত্মক ভাষাকেই নিজের পরিচয় বলে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। সামাজিক বর্জনের এই ভাষাতাত্ত্বিক হিংসা শেষ পর্যন্ত সোরধনীর আত্মপরিচয়কে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে দেয়। সোরধনীর সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি হল, সমাজের সঙ্গে তার দ্বন্দ্ব শেষ পর্যন্ত নিজের সঙ্গে নিজের দ্বন্দ্বে পরিণত হয়। তাই শিশুটিকে দেখে তার মনে যে প্রবল আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়, সে নিজেই তাকে 'ডাইনী'র ক্ষুধা বলে ব্যাখ্যা করে। কিন্তু একই সঙ্গে তার মধ্যে শিশুটির প্রতি মমতাও রয়েছে। তার এই দ্বন্দ্ব বিশেষভাবে তীব্র হতে দেখা যায় তার পরের সংলাপের মধ্য দিয়ে। একদিকে সে শিশুটিকে দেখে অদ্ভুত আকর্ষণ অনুভব করে, অন্যদিকে আতঙ্কে বলে—

> "খেয়ে ফেললাম— ছেলেটাকে খেয়ে ফেললাম রে। পালা পালা, তুই ছেলে নিয়ে পালা বলছি।"[১৩]

এই দৃশ্যকে আক্ষরিক অর্থে পড়লে সোরধনীকে সত্যিই 'ডাইনী' বলে ধরে নেওয়ার সুযোগ তৈরি হয়। কিন্তু পরবর্তী ঘটনাগুলি দেখায়, এখানে তার নিজের মানসিক ভয় এবং সামাজিকভাবে আরোপিত 'ডাইনী' পরিচয়ের সংঘাত কাজ করছে। আরও তাৎপর্যপূর্ণ হল, ঈশ্বরের কাছে নিজেকে 'মানুষ' করে দেওয়ার আবেদন করতে দেখা যায় বারবার তাকে -

> "মা, আমাকে ডাইনী হইতে মানুষ করিয়া দাও, আমি তোমাকে বুক চিরিয়া রক্ত দেব।"[১৪]

গল্পের শেষের দিকে সোরধনীর অতীত প্রেমের স্মৃতি তার চরিত্রকে আরও মানবিক করে তোলে। যে নারীকে সমাজ অশুভ শক্তির প্রতীক হিসেবে দেখেছে, সেই নারীই একসময় ভালোবেসেছে, সংসার করেছে এবং স্বামীকে হারিয়েছে। স্বামীর মৃত্যুর স্মৃতিও তার মনে অপরাধবোধ তৈরি করে। সমাজের 'ডাইনী' বিশ্বাস এত গভীরভাবে তার চেতনায় প্রবেশ করেছে যে স্বামীর স্বাভাবিক মৃত্যুকেও সে নিজের দৃষ্টির ফল বলে মনে করতে শুরু করে। এই আত্মদোষারোপ তার ব্যক্তিসত্তার ওপর সামাজিক বিশ্বাসের গভীর প্রভাব প্রকাশ করে। অর্থাৎ সোরধনী শুধু সমাজের দ্বারা বর্জিত নয়, সে নিজের কাছেও অপরাধী হয়ে উঠেছে। গল্পের শেষ পর্যায়ে সোরধনী পালিয়ে যেতে চায়। সে বুঝতে পারে, আর এই গ্রামে থাকা সম্ভব নয়। গল্পের শেষ অংশে দেখা যায়—

> "পায়ে পায়ে ধূলা উড়াইয়া বৃদ্ধা ডাইনী পলাইয়া যাইতেছিল।"[১৫]

কিন্তু তার পালিয়ে যাওয়াও তাকে রক্ষা করতে পারে না। ঝড়ের মধ্যে তার মৃত্যু ঘটে। পরদিন মানুষ তার মৃত্যুরও একটি অতিপ্রাকৃত ব্যাখ্যা তৈরি করে—

> "আকাশ-পথে যাইতে যাইতে এ গুণীনের মন্ত্রপ্রহারে পক্ষপক্ষী পাখির মত পড়িয়া এ গাছের ডালে বিদ্ধ হইয়া মরিয়াছে।"[১৬]

এই শেষ অংশটি গল্পের সামাজিক ব্যঙ্গ ও ট্র্যাজেডিকে একসঙ্গে ধারণ করে। সোরধনীর মৃত্যু পর্যন্ত বাস্তব মানবিক ঘটনা হিসেবে গ্রহণ করা হয় না, তার মৃত্যুকেও লোকবিশ্বাসের কাঠামোর মধ্যে ব্যাখ্যা করা হয়। ফলে মৃত্যু তার 'ডাইনী' পরিচয়কে শেষ করে না, বরং লোকবিশ্বাসের মধ্যে সেই পরিচয়কে আরও দৃঢ় করে। পরিশেষে বলা যায়, তারাশঙ্করের 'ডাইনী' গল্পটি লোকসংস্কৃতির স্বাভাবিক ঐতিহ্যকে অস্বীকার না করেও তার অন্তরালে লুকিয়ে থাকা সামাজিক নিষ্ঠুরতা ও নারী-নিপীড়নের অন্ধকার রূপটিকে নির্মোহভাবে উন্মোচন করেছে। সমকালীন সমাজবাস্তবতায় আজও প্রান্তিক জনপদে তথাকথিত 'ডাইনি শিকার' বা কুসংস্কারের নামে নারীহত্যার যে ঘটনা ঘটে, তার মনস্তাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক উৎস এই গল্পে অত্যন্ত স্পষ্ট। ফলে সোরধনী কেবল রাঢ় বাংলার অতীত ইতিহাসের চরিত্র নয়, বরং যুগে যুগে প্রাতিষ্ঠানিক ও সামাজিক নিপীড়নের শিকার হওয়া প্রতিটি প্রান্তিক নারীর একচিরন্তন ট্র্যাজিক প্রতীক।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 14
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 124 - 131
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Reference:

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, 'ডাইনী', তারাশঙ্কর-রচনাবলী, সম্পা. গজেন্দ্রকুমার মিত্র, সুমথনাথ ঘোষ এবং সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ৭ম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৯৭৬, পৃ. ৪৭৮
২. তদেব, পৃ. ৪৭৮
৩. তদেব, পৃ. ৪৭৮
৪. তদেব, পৃ. ৪৭৯
৫. তদেব, পৃ. ৪৮১
৬. তদেব, পৃ. ৪৮২
৭. তদেব, পৃ. ৪৮২
৮. তদেব, পৃ. ৪৮২
৯. তদেব, পৃ. ৪৮২
১০. তদেব, পৃ. ৪৮৬
১১. তদেব, পৃ. ৪৮৭
১২. তদেব, পৃ. ৪৮৩
১৩. তদেব, পৃ. ৪৮১
১৪. তদেব, পৃ. ৪৮২
১৫. তদেব, পৃ. ৪৮৯
১৬. তদেব, পৃ. ৪৮৯

Bibliography:

চক্রবর্তী, সুধীর, লোকসমাজ ও লোকচিত্র, পত্রলেখা, ২০১২
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ডাইনি' : মিথ্যা অপবাদে জীবন বিনষ্টির গল্প, এবং প্রান্তিক, খণ্ড ১২, সংখ্যা ৩০, ২০২৬
বিশ্বাস, মিল্টন, বাংলা ছোটগল্পে ডাইনি চরিত্র (পঞ্চম পর্ব), PageFour, ৩ জানুয়ারি ২০২৪
বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প, দে' জ পাবলিশিং, কলকাতা
হাঁসদা, জয়দেব, "নিম্নবর্গীয় সম্প্রদায়ের জীবনচেতনা : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচিত ছোটগল্প", Trisangam International Refereed Journal, খণ্ড ৬, সংখ্যা ২, ২০২৬
বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, 'ডাইনী', তারাশঙ্কর-রচনাবলী, সম্পা. গজেন্দ্রকুমার মিত্র, সুমথনাথ ঘোষ এবং সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ৭ম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৯৭৬, পৃ. ৪৭৭–৮৯